যুগব্যবধানে দুই অবতার : শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রব্রাজিকা বিদ্যাত্মপ্রাণা

বৌদ্ধ ভিক্ষু মালুঙ্কপুত্ত। বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, অনুসরণ করছেন গুরু-নির্দেশিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ। অথচ আজ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের উত্তর তাঁর গুরুর কোনও উপদেশের মধ্যে পাননি : এই জগৎ কি সত্য, মৃত্যুর পরেও কি মানুষের অস্তিত্ব থাকে?—এইসব প্রশ্নে তাঁর মন বড়ই অশান্ত। স্থির করলেন, সরাসরি বুদ্ধদেবকেই জিজ্ঞাসা করবেন। করলেনও তাই। সেইসঙ্গে একথাও বললেন, বুদ্ধদেব যদি এসব প্রশ্নের উত্তর না জানেন, তিনি যেন স্পষ্ট স্বীকার করেন যে, এইসব প্রশ্নের উত্তর তাঁর অজানা। শিষ্যের এই অমার্জিত আচরণে একটুও বিরক্ত হলেন না বুদ্ধদেব। উপরন্তু তাঁর সত্যকে জানার এই অদম্য স্পৃহা দেখে স্নেহস্বরে বললেন, ''মালুঙ্কপুত্ত, মনে করো, কোনও এক ব্যক্তির শরীরে একটি বিষাক্ত বাণ ফুটেছে। তাঁর স্বজন এবং হিতৈষীরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শরীর থেকে বাণটা বের করে ফেলার জন্য চিকিৎসক ডাকতে যাচ্ছেন, এমন সময় সেই ব্যক্তি বলে উঠলেন—কতগুলো প্রশ্নের উত্তর না জানা পর্যন্ত আমি কিছুতেই বাণটিকে বের করতে দেব না। যে এই বাণ মেরেছে তার নাম এবং গোত্র, তার দৈহিক গঠন—সে লম্বা না বেঁটে না সাধারণ উচ্চতার, তার ঠিকানা—সে কোথায় থাকে, গ্রামে না শহরে, না মফস্বলে এসব কিছু আমাকে আগে জানতে হবে। আমাকে আরও জানতে হবে এই বাণটি কী ধরনের এবং কী দিয়ে তৈরি।"

বুদ্ধ বললেন, ''দেখো মালুঙ্কপুত্ত, মানুষটি মরে যাবে, কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর তার পক্ষে জানা সম্ভব হবে না। মালুঙ্কপুত্ত, আমি যা বলেছি, তার সবই বলা হয়েছে, আর আমি যা বলিনি, তার কিছুই বলা হয়নি। আমি বলেছি, দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের বিনাশ সম্ভব এবং দুঃখ বিনাশের উপায়ও আছে। এবার প্রশ্ন, কেন আমি শুধু এটাই বলেছি? কারণ এটিই আধ্যাত্মিক পথে চলার মূল নীতি, এটি জানলেই বাসনা থেকে নিবৃত্তিলাভ এবং ক্রমে নির্বাণলাভ সম্ভব।"[১]

ভগবান বুদ্ধের এই বাণীর অনুরণন শুনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিতে : ''বাগানে কত গাছ, গাছে কত ডাল—এ-সব হিসাবে তোমার কাজ কি? তুমি বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও।"[২] একথা বলেছেন, আবার জীব-জগৎ-ঈশ্বর বিষয়ে তিনিই আমাদের একটা ধারণা দিয়েছেন, যদিও এসকল বিষয় সম্বন্ধে সঠিক ধারণা একমাত্র প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারাই সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ''কি দেখছি জানো? তিনি সব হয়েছেন!

মানুষ আর যা জীব দেখছি, যেন চামড়ার সব তয়েরি—তার ভিতর থেকে তিনিই হাত পা মাথা নাড়ছেন!... দেখছি—সে-ই কামার, সে-ই বলি, সে-ই হাড়িকাঠ হয়েছে!"[৩] শ্রীরামকৃষ্ণ এবারে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা 'শ্রীম'কে। তাঁর কথা যাতে শ্রীম ঠিকমতো বুঝতে পারেন, তাই তিনি মাঝেমাঝে প্রশ্ন করে দেখেছেন শ্রীম সব ঠিকমতো ধারণা করতে পেরেছেন কি না এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে 'শ্রীম'র ভুল হলে সেই ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন।

বুদ্ধদেব কিন্তু জগতের স্বরূপ বা আত্মা বিষয়ে কোনও আভাস দেননি। যে-বস্তু সম্বন্ধে ধারণা প্রত্যক্ষ অনুভূতি ব্যতিরেকে অসম্ভব, সে-সম্বন্ধে তিনি নির্বাক থেকেছেন। তাঁর প্রচারিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ সুউচ্চ নৈতিক জীবনযাপনের কথা বলে। এই সংযমপূর্ণ জীবনই মানুষকে বিষয়বাসনাশূন্য হয়ে, পরিণামে নির্বাণলাভের অধিকারী করে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই শিষ্যরা বুদ্ধদেবের উপদেশ সম্যক ধারণা করতে পারেননি। বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের পর তাঁরা বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক ধর্মরূপে প্রচার করতে শুরু করেন। তাঁর উপদেশের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হয়ে জন্ম হয় হীনযান, মহাযান ও তাদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মতবাদের। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় বেদপ্রামাণ্যের বিরোধী এক নতুন ধর্মরূপে। বুদ্ধ-পরবর্তী যুগে বৌদ্ধধর্মের অবনতির কারণ নির্ণয় করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ : ''বৌদ্ধধর্ম ছিল সংস্কারমূলক। ধর্ম-বিপ্লব আনবার জন্য তাঁকে অনেক নাস্তিবাচক শিক্ষাও দিতে হয়েছিল। কিন্তু কোনও ধর্ম যদি নাস্তি-ভাবের দিকেই বেশি জোর দেয়, তার সম্ভাব্য বিলুপ্তির আশঙ্কাও থাকবে সেখানেই। শুধুমাত্র সংশোধনের দ্বারাই কোনও সংস্কারমূলক সম্প্রদায় টিকে থাকতে পারে না;—সংগঠনী উপাদানই হচ্ছে যথার্থ প্রেরণা—যা তার মূল প্রেরণা। সংস্কারের কাজগুলি সম্পন্ন হবার পরই অস্তি-ভাবমূলক কাজের দিকে জোর দেওয়া উচিত; বাড়ি তৈরি হয়ে গেলেই ভারা খুলে ফেলতে হয়।

''ভারতবর্ষে এমন হয়েছিল যে, কালক্রমে বুদ্ধের অনুগামীরা তাঁর নাস্তি-ভাবমূলক উপদেশগুলির প্রতি বেশিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়, ফলে তাদের ধর্মের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল।"[৪]

বুদ্ধদেবের প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে শরীরধারণ করলেও যোগদৃষ্টিসহায়ে বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্বটি বুঝে নিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অসুবিধা হয়নি। তাঁর পরম অনুগত ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র ঘোষ যখন বুদ্ধদেবের লীলাময় জীবন অবলম্বনে 'বুদ্ধচরিত' নাটক মঞ্চস্থ করেন, তখন সেই নাটক দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেছিলেন : ''শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ঈশ্বরাবতার ছিলেন ইহা নিশ্চয়, তৎপ্রবর্তিত মতে ও বৈদিক জ্ঞানমার্গে কোন প্রভেদ নাই।"[৫] শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের কাছে ভগবান বুদ্ধ প্রসঙ্গে বলেছেন : ''বুদ্ধদেবের কথা অনেক শুনেছি, তিনি দশাবতারের ভিতর একজন অবতার। ব্রহ্ম অচল, অটল, নিষ্ক্রিয় বোধ-স্বরূপ। বুদ্ধি যখন এই বোধ-স্বরূপে লয় হয় তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়; তখন মানুষ বুদ্ধ হয়ে যায়।"[৬]

বুদ্ধদেব যে বাক্যমনাতীত ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাতেই তা স্পষ্ট। বুদ্ধদেবের তাত্ত্বিক দিকটি উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চরিত্রের একটি অনালোচিত দিকেও আলোকপাত করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বুদ্ধদেব শুধু জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ নন, তিনি একজন অসাধারণ প্রেমিক। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি : ''যে প্রেমে বুদ্ধ রাজভোগ ত্যাগ করে বৈরাগী হয়েছিলেন, সেই প্রেমের একবিন্দু যদি উদয় হয়, এই অনিত্য সংসার কোথায় পড়ে থাকে!"[৭] শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধ ভক্তি যে একই সত্যের দিকে মানুষকে প্রেরিত করে, বুদ্ধচরিত্র তারই নিদর্শন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বুদ্ধদেবকে যে শুধু অবতাররূপে মান্যতা দিয়েছেন তাই নয়, একই পূর্ণব্রহ্ম যে

যুগভেদে বুদ্ধদেব এবং তাঁর মধ্যে প্রকট হয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিতে রয়েছে তারই ইঙ্গিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন : ''শ্রীবুদ্ধদেবকে তিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া শ্রদ্ধা ও পূজা সর্বকাল অর্পণ করিতেন এবং পুরীধামস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সুভদ্রা-বলভদ্ররূপ ত্রিরত্নমূর্তিতে শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারের প্রকাশ অদ্যাপি বর্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদে ভেদবুদ্ধির লোপ হইয়া মানবসাধারণের জাতিবুদ্ধি বিরহিত হওয়া-রূপ উক্ত ধামের মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া তিনি তথায় যাইবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু তথায় গমন করিলে নিজ শরীরনাশের সম্ভাবনা জানিতে পারিয়া এবং যোগদৃষ্টিসহায়ে শ্রীশ্রীজগদম্বার ঐ বিষয়ে অন্যরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।''[৮]

প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথের কাছে অকপটে স্বীকার করেছেন যে তাঁর অবস্থা বুদ্ধদেবের অবস্থাকেও ছাপিয়ে গেছে। এ-প্রসঙ্গে কথামৃতে শ্রীম ছোট্ট একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীরত্যাগের কিছু মাস আগে প্রবল বৈরাগ্যের প্রেরণায় যুবক নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কিছু না জানিয়ে বুদ্ধগয়ায় যান, তপস্যার জন্য। ঠাকুর তখন খুবই অসুস্থ, বেশিরভাগ কথা আকারে ইঙ্গিতে বলেন। বুদ্ধগয়া থেকে ফিরে আসার পর নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধপ্রসঙ্গ করছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

নরেন্দ্র—তিনি তপস্যার পর কি পেলেন, তা মুখে বলতে পারেন নাই। তাই সকলে বলে, নাস্তিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ইঙ্গিত করিয়া)—নাস্তিক কেন? নাস্তিক নয়, মুখে বলতে পারে নাই। বুদ্ধ কি জানো? বোধ স্বরূপকে চিন্তা করে করে,—তাই হওয়া,—বোধ স্বরূপ হওয়া।

বুদ্ধদেব বলতেন, বুদ্ধত্ব একটি অবস্থা বিশেষ। যে-কোনও মানুষই সেই অবস্থা লাভ করতে পারে। বুদ্ধরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ যেন আবারও সেই একই কথা মনে করিয়ে দিলেন।

বেশ কিছু কথাবার্তার পর ঠাকুর আবার নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—ইঙ্গিত করে

শ্রীরামকৃষ্ণদেব—(বুদ্ধদেবের) কি, মাথায় ঝুঁটি?

নরেন্দ্র—আজ্ঞা না, রুদ্রাক্ষের মালা অনেক জড় করলে যা হয়, সেই রকম মাথায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—চক্ষু?

নরেন্দ্র—চক্ষু সমাধিস্থ।

ঠাকুর আবার বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অল্প হেসে নরেন্দ্রকে বলছেন—আচ্ছা, এখানে সব আছে, না?—নাগাদ মুসুর ডাল, ছোলার ডাল, তেঁতুল পর্যন্ত।[৯]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রিয় শিষ্যের কাছে নিজের স্বরূপের পরিচয় দিচ্ছেন। নিজেকে প্রকাশ করছেন—তাঁর মধ্যেই সব—এখানে ওখানে না ঘুরে তাঁকে ধরে থাকলেই সব হবে।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বুদ্ধদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী এবং আচরণের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী বুদ্ধদেবের বাণীতে এক গভীরতর অর্থ ও তাৎপর্য সংযোজন করেছে। বুদ্ধদেবের বাণীর মূল তত্ত্বের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারিত বাণীর মূল তত্ত্বটির পার্থক্য প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি ঘটনা।

একবার প্যারিসে এক ব্যক্তি স্বামীজীকে প্রশ্ন করেন : ''সনাতন হিন্দুধর্ম এককেই সৎ ও বহুকে অসৎ বলিয়াছেন, আবার বুদ্ধ কি বহুকেই সৎ ও (তদধিষ্ঠান) অহংকে অসৎ বলেন নাই?''

স্বামীজী উত্তর দিলেন : ''হ্যাঁ। আর শ্রীরামকৃষ্ণ ও আমি উহাতে শুধু এইটুকু যোগ করিয়াছি যে, বহু ও এক উভয়ে একই মনের দ্বারা বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন অবস্থায় উপলব্ধ সেই একই সত্য।''[১০]

জগতের আপাত বৈচিত্র্যের অন্তরালে কোনও এক অপরিবর্তনীয় সত্য আছে কি না এ-প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধদেব দেননি। অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন করেছিলেন এই বলে, জগতের আপাত বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব দেখাই চরম আধ্যাত্মিক উপলব্ধি।

জগতের আপাত বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই একই সত্তা বিদ্যমান আছে জেনেছিলেন বলেই বুদ্ধদেব জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ এমনকি অবোলা পশুপাখিকেও নিজের কোলে টেনে নিয়েছিলেন। রাজগিরের বারাঙ্গনা আম্রপালীর নিমন্ত্রণ তিনি নিঃসংকোচে গ্রহণ করেছিলেন। একইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও সব রকমের সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে বিনোদিনী প্রমুখ অভিনেত্রীকে আশ্রয় দিয়েছেন, তাদের জীবনের সমস্ত কালিমা মুছিয়ে সন্ধান দিয়েছেন অমৃতপথের।

বুদ্ধদেবের জীবনের আর একটি ঘটনা। বোধিলাভের পর তিনি কপিলাবস্তুতে এসেছেন পিতা শুদ্ধোদনের আমন্ত্রণে। তাঁর দীপ্তকান্তি এবং উপদেশে আকৃষ্ট হয়ে কয়েকজন অভিজাত শাক্যবংশীয় যুবক তাঁর কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণের প্রার্থনা নিয়ে এসেছেন। এমনসময়ে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী হয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন নাপিতের ছেলে উপালি। সমবেত সকলে অবাক হয়ে দেখলেন, বুদ্ধদেব উপালিকেই সর্বপ্রথম দীক্ষা দিলেন। একইধরনের ঘটনার প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে। ব্রাহ্মণবালক গদাধর নীচবংশজাত ধনি কামারিনির হাত থেকে উপনয়নের পর প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করলেন, সকলের নিষেধ অমান্য করে। বালক গদাধর প্রচার করলেন, উচ্চ বংশ বা বর্ণ নয়, দীনতা ও আর্তিই ঈশ্বরলাভের প্রথম ও প্রধান শর্ত।

মৃত্যু আসন্ন জেনেও বুদ্ধদেব নীচকুলোদ্ভব চুন্দের দেওয়া শূকরান্ন গ্রহণ করেছিলেন নির্বিকার চিত্তে। আবার অতি দরিদ্র ও অন্ত্যজ পুণ্যাদাসীর নিবেদন করা একটুকরো পোড়ারুটি ভিক্ষারূপে গ্রহণ করেছিলেন পরম তৃপ্তির সঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনেও আমরা অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখি, যখন তিনি গোপালের মার আনা দু-পয়সার দেদো সন্দেশ সাগ্রহে চেয়ে খান। দক্ষিণেশ্বরের মেথর রসিকের প্রতি তাঁর অপার করুণা ও আশীর্বাদ সেযুগের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত আশ্চর্য এক ঘটনা। কিন্তু তিনি এখানেই থেমে থাকেননি। গভীর রাতে সবার অলক্ষ্যে নিজের চুল দিয়ে রসিকের বাড়ির নর্দমা পরিষ্কার করে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিলেন বেদান্তের সেই বাণী 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—সবার মধ্যে সেই একই ব্রহ্ম বিরাজমান। বিজ্ঞানের যুগ সবসময় হাতেনাতে প্রমাণ চায়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাজ দিয়ে সেটাই দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। বুদ্ধদেব জাতপাত নির্বিশেষে সকলকে দয়া করেছেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের মধ্যে যে শুধু তাঁর বাণী প্রচার করেছেন তা নয়, আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সবার মধ্যে সেই একই ব্রহ্ম—এইটি সত্যরূপে উপলব্ধি করে সকলের প্রতি সমান আচরণ করেছেন, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে শিবজ্ঞানে সেবাকে তিনি ঈশ্বরলাভের পথরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—এযুগে এই নতুন পথপ্রদর্শন অবতাররূপে তাঁর বিশেষ অবদান।

বুদ্ধদেব সর্ববিষয়ক ত্যাগের মাধ্যমে নির্বাণলাভের কথা প্রচার করেছেন—সন্ন্যাসব্রত অবলম্বনকে তিনি পরম কর্তব্যরূপে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু অনধিকারী সাধারণ মানুষ এই চরম আদর্শ গ্রহণ করতে গিয়ে বিপথে চলে গেছে—বৌদ্ধধর্ম দ্রুত অবনতির দিকে এগিয়ে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু তাঁর গৃহী এবং ত্যাগী ভক্তদের দুরকম উপদেশ দিয়েছেন। রবিবার, ছুটির দিনে সময় দিয়েছেন গৃহীদের জন্য আবার অন্তরঙ্গ ত্যাগী ভক্তদের নিভৃতে উপদেশ দিয়েছেন। গৃহীদের প্রতি

তাঁর উক্তি : ''তোমরা সংসার করো, অনাসক্ত হয়ে। গায়ে কাদা লাগবে কিন্তু ঝেড়ে ফেলবে, পাঁকাল মাছের মতো। কলঙ্কসাগরে সাঁতার দেবে—তবু গায়ে কলঙ্ক লাগবে না।''[১১]

ত্যাগী ভক্তদের প্রতি তাঁর উপদেশ এর থেকে একেবারেই আলাদা। সংসারের সবরকম সংস্রব থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দিয়েছেন : ''সন্ন্যাসী কামিনী-কাঞ্চন দুই-ই ত্যাগ করবে—যেমন মেয়ের পট পর্যন্ত দেখবে না, তেমনি কাঞ্চন—টাকা—স্পর্শ করবে না।... সন্ন্যাসীর এ কঠিন নিয়ম কেন? তার নিজের মঙ্গলের জন্যও বটে, আর লোকশিক্ষার জন্য।''[১২]

হিন্দুধর্ম সন্ন্যাসাশ্রমের যথেষ্ট প্রশংসা করলেও চিরকাল নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালনকেই ঈশ্বরলাভের পথ বলে নির্দেশ দিয়ে এসেছে। হিন্দুধর্মের এই চিরন্তন আদর্শটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনে রূপায়িত করেছেন একাধারে আদর্শ গৃহী ও সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করে।

পরিশেষে বলা যায়, যুগপ্রয়োজনে ঈশ্বরাবতারের আবির্ভাব। যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী যুগাবতার তাঁর জীবনযাপন করেন, জনসাধারণকে সঠিক পথে চালিত করেন। পরবর্তী অবতারদের জীবনে পূর্ববর্তী অবতারদের বাণী আরও বেশি পরিপূর্ণতা লাভ করে—এইটিই লীলাময়ের লীলা!

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করি বুদ্ধজীবনের মহত্তর, উন্নততর প্রকাশ। অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ একবার রহস্য করে বলেছিলেন, ''আর একবার আসতে হবে। তাই পার্ষদদের সব জ্ঞান দিচ্ছি না। তোমাদের যদি সব জ্ঞান দিই—তাহলে তোমরা আর সহজে আমার কাছে আসবে কেন?''[১৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতার যে বুদ্ধ-অবতারকে ছাপিয়ে যাবেন, সেই সত্য এই উক্তির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন। বুদ্ধ-অবতারে শিষ্য মালুঙ্কপুত্তের প্রশ্নের যে-উত্তর দেননি, সে-উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে দিয়ে গেলেন। অনেক প্রশ্ন-উত্তরের পরেও শেষ কথা একটাই, সে-কথা তিনি নিজমুখে পার্ষদদের বলেছেন, ''এবার সব এখানে; আর যেখানেই যাও না কেন কোথাও কিছু পাবে না। এখানকার সব দোর খোলা।''[১৪] অর্থাৎ যো-সো করে তাঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) ধরতে হবে, তাঁর শরণে এলে চৈতন্য হবেই।

তথ্যসূত্র

১। *Eternal Values for a Changing Society,* Vol II, pg. 47-48

২। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১), অখণ্ড, পৃঃ ৪৬৫ [এরপর, *কথামৃত*]

৩। তদেব, পৃঃ ১০২২-২৩

৪। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০), খণ্ড ৮, পৃঃ ২১১

৫। স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০), ভাগ ১, সাধকভাব, পৃঃ ২১৩ [এরপর, *লীলাপ্রসঙ্গ*]

৬। *কথামৃত,* পৃঃ ৪৩০

৭। তদেব, পৃঃ ৩১১

৮। *লীলাপ্রসঙ্গ,* সাধকভাব, পৃঃ ২১২

৯। *কথামৃত,* পৃঃ ১০২৮-৩০

১০। ভগিনী নিবেদিতা, অনুবাদক : স্বামী মাধবানন্দ, *স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি* (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬১), পৃঃ ২৫

১১। *কথামৃত,* পৃঃ ৭৯৭

১২। তদেব, পৃঃ ৩৮৫

১৩। তদেব, পৃঃ ৩৫২

১৪। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), খণ্ড ১, পৃঃ ১৫৬